ক্যাকটাস

সুবোধ ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

যা যা আছে

অভিমানিনী বিল্লি বাঘিনী ■ ১১
বাবু রতন রায়ের ঘোড়া ■ ১৭
মধুগঞ্জের সুমতি ■ ৩০
ক্যালাস্থিস্ করুণাইনা ■ ৪২
জগমোতির পাহাড়ী ময়না ■ ৫২
জঙ্গল প্রেমিক উড সাহেব ■ ৬৪
সিমারিয়ার বনবালা ■ ৭৮
চেতনপুরার বিশপ হ্যাটো ■ ৮৭
শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী ■ ৯৭
পাখি সদা সুখী ■ ১১০
তিন পাহাড়ীর বুড়ো বট ■ ১১৩
সমাজসেবী মীর্ণা রায় ■ ১২০
ডায়েনা ও মালতী ■ ১২৬
নিমগাছ ও রাতের পাখি ■ ১৪১
একজন দ্বিতীয় জনমেজয় ■ ১৫২
জগনপুরের দীপালি রায় ■ ১৬১
মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি ■ ১৭৮
বসুধৈব কুটুম্ বকম্ ■ ১৯০
হরেন বাবুর হরিণী মেয়ে ■ ২০৩
ক্যাকটাস ■ ২১৫

অভিমানিনী বিলি বাঘিনী

কাঁকুলিয়া।
পয়লা শ্রাবণ।

স্নেহের পুতুল,

তুমি আবার জিজ্ঞেস করেছ, গল্পগুলি কি সবই সত্যি? বুঝতে পারছি, তোমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার ইচ্ছা, গল্পের দুঃখগুলি সব মিথ্যে হয়ে যাক্, আর মজাগুলি সব যেন সত্যি হয়! তা ছাড়া, তুমি গল্পের অনেক ভুল ধরেছ। তুমি লিখেছ--"বাংলা স্কুলের ছেলেরা কেন আরও এক ঘন্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে গয়ারোডের কাছে চলে যায়নি? তাহলেই তো সবাই গান্ধীজীকে দেখতে পেত।" তুমি লিখেছ--"ধরণী পণ্ডিত মশাই আর চিত্তদার সঙ্গে আর একবার ভাব হয়ে গেলেই তো বেশ হতো। ভাব হলো না কেন?"

কিন্তু এসব আমার গল্পের ভুল নয়, পুতুল। এসব লোকের জীবনের ভুল। সত্যি সত্যি বাংলা স্কুলের ছেলেরা বুদ্ধি করে এক ঘন্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। সত্যি সত্যি চিত্তদা আর ধরণী পণ্ডিতের মধ্যে কিছুতেই আর ভাব হয়নি। আমি কি করবো বল?

এখন শ্রাবণ মাস। আকাশ ছাপিয়ে বর্ষা নেমেছে। আজ কিসের গল্প বলি? বাঘটাঘ? ভূতটুত? তুমি বলবে, হ্যাঁ বাঘটাঘের গল্পই আজ বেশ জমবে। বেশ মজা লাগবে। হাজারিবাগের সন্ধ্যে বেলায় বাইরে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়বে। দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বালিয়ে বিছানার ওপর বসে সবাই মিলে বাঘের গল্প পড়তে খুব ভাল লাগবে। গল্পের বাঘ দূর জঙ্গলের ভেতর ভীষণ গর্জন করবে, ভীতু হরিণের ঘাড় মট্কাবে। ঘরের ভেতর বিছানার ওপর বসে মিথ্যে ভয় ভয় করবে।

বেশ মজা লাগবে, না?

বেশ, বাঘের গল্পই বলবো। কিন্তু আমার বাঘ যদি হালুম হালুম না করে, যদি ভীতু হরিণের ঘাড় না মট্কায়, তবে আমাকে দোষ দিও না। কিন্তু আমি গল্পে ফাঁকি দেব না। কেননা, ফাঁকির গল্প আমি জানি না।

আমারও এখন বাঘটাঘের কথা মনে পড়ছিল। এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় বড় মেঘের টুকরো গুলিকে দেখে আমার তাই মনে হয়। মেঘগুলি আকাশের কিনারা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোনটার চেহারা সিংহের মত, কোনটা হাতীর মতো, কোনটা বাঘের মত। এক একটা মেঘের দলকে দেখাচ্ছে যেন একটা শিংওয়ালা নীল গাইয়ের দল, স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। মনে হয়, আকাশের কোথাও একটা চিড়িয়াখানার ফটক ভেঙে গেছে। দলে দলে জন্তু জানোয়ার ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা বাঘ তারাই শুধু মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে গর্জন করে। তার পরেই বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ঝর্ঝর্ করে!

তবে শোন--বিলির জীবনকাহিনী।

কে এই বিলি?

এই বিলিই আমার গল্পের বাঘ। জাতে সোনাচিতা। দেশ চাত্রার জঙ্গল।

বিলির জীবনীর প্রথম অধ্যায় শোন। চাত্‌রা থেকে মোটর বাসে হাজারিবাগ আসছিলাম। খুব ভোরে এক নদীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য মোটর বাস থামলো। এখানে সড়কের দু'পাশে মাঠের মত বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই জঙ্গল। আমরা মোটর বাসে বসেই দেখছিলাম, একটু দূরে মাঠের ওপর এক মহুয়ার গাছের নীচে ছোট্ট একটি জীব খেলা করছে। মোটর বাসের খালাসীটা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার পরেই দৌড়ে গিয়ে মহুয়া তলা থেকে ছোট্ট জীবটাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে এল! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম--একটা সোনাচিতার বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চা। বাঘিনী মা নিশ্চয় কাছে কোথাও আছে। এখুনি ফিরে আসবে। তারপর?

না, আমরা আর এক মুহূর্ত দেরী করিনি। তখুনি মোটর বাস ছেড়ে দিল। কিছু দূর যাবার পর বাসের জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে মহুয়া তলার দিকে তাকালাম। মনে হল, মহুয়া তলায় সাদা কুয়াসার মধ্যে যেন একটা ছায়াময় দুরন্ত জন্তুর মূর্তি ছটোপুটি করছে, মাটি শুঁকে শুঁকে কিছু খুঁজছে। আমাদের মোটর বাস আরও জোরে দৌড়তে আরম্ভ করলো।

খালাসীর কাছ থেকে সোনাচিতার বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ডাকলাম--বিলি! হঠাৎ নামটা মুখে এসে গেল।

খুব সন্ত্রস্ত হয়ে শান্তভাবে আমার কোলের ওপর বসেছিল বিলি। ড্রাইভার হর্ণ বাজাচ্ছিল, স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল। বিলি চুপচাপ বসে স্থিরদৃষ্টি তুলে সব কাণ্ডকারখানা দেখছিল। দেখলাম বিলির গাটা তখনো শিশিরে ভিজে রয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছে দিলাম। আরামে মাথাটা কাত করে শুয়ে রইল বিলি। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে একেবারে নতুন দেশের জীব হয়ে গেল বিলি। দেখে মনে হচ্ছিল, বিলি যেন কতদিন ধরে এই মোটর বাসে নিয়মিত যাওয়া আসা করছে। এখন মহুয়া-তলায় কুয়াসার ভেতর যে বাঘিনী মায়ের স্বপ্ন ছট্‌ফট্‌ করছে, বিলির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। জঙ্গলের ঘন ছায়া আর একটা পাথুরে গুহার অন্ধকারের স্নেহ থেকে বিলির প্রাণ যেন একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। কলের গাড়ির ওপর চড়ে বিলি তখন আমাদের সঙ্গে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে শহরের দিকে। জঙ্গলের সীমা শেষ হতে চলেছে।

আমাদের মোটর বাস কোম্পানীর অফিসে দই আর হলুদ-জলে সেদ্ধ মাংস খেয়ে বড় হতে লাগলো বিলি। এক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। ছোট্টখাট্ট এক পালোয়ানের মত দেখাতো বিলিকে। বক্সিং গ্লাভ্‌সের মত চওড়া থাবা, আঁটসাঁট শরীরে চক্‌চকে চামড়ার আড়ালে মাংসের পেশীগুলি গোল গোল বলের মত যেন নাচানাচি করতো। গায়ের ওপর কালো-হলুদে মেশানো ছোপগুলি দেখে মনে হতো বিলিকে যেন এক খেলোয়াড়ের ইউনির্ফম পরিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা খুঁটোর সঙ্গে লম্বা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো বিলি। সারা দিন ঘুমিয়ে আর লাফঝাঁপ করে বিলির সময় কেটে যেত। সারা রাত বিলি ঘুমোত না। মনের সুখে চিৎকার আর লাফালাফি করতো। লাফালাফি করার জন্য যেন একটা নেশা ছিল বিলির। একদমে, একটানা, ক্লান্তিহীন ও ক্ষান্তিহীন ভাবে বিলি অকারণে লাফাতো, থাবা ঘসতো, পাঁয়তাড়া করতো। বিলির খেলার হরেক রকম কায়দা দেখে আমরা অবাক্‌ হয়ে যেতাম। বিলির জীবন থেকে শৈশবেই তো তার জঙ্গল মুছে গেছে। তবে এত জংলী পাঁয়তাড়ার দরকার কি? কোথা থেকে এসব কৌশল শিখলো বিলি? শিকার মেরে খাবার কোন প্রয়োজন কখনো হয়নি বিলির, ভবিষ্যতেও হবার কোন কারণ নেই। তবু বিলি এত চেষ্টা করে সেই হিংস্র জীবিকার কৌশল মক্স করে কেন?

গয়লা যখন দুধ দোয়, বিলি গরুটার দিকে একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে থাবা লুকিয়ে

কুঁকড়ে বসে পড়ে। আস্তে আস্তে লেজ নাড়ে। তার পরেই প্রচণ্ড একটা লাফ দেয়। কিন্তু শেকলে বাঁধা বিলির আক্রমণ শূন্যে ব্যর্থ হয়ে মিলিয়ে যায়।

দূরে পথ দিয়ে ঘোড়াগাড়ি যায়, দু'চারটে খেঁকি কুকুর পথ ভুলে বাগানের দিকে বেড়াতে আসে। বিলি চোরের মত নিঃশব্দে ঘোড়া আর কুকুরগুলোর দিকে জ্বলন্ত লক্ষ্য রেখে থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে। ঘোড়া আর কুকুরেরা চলে যায়। বিলি কিছুক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকে। তারপরেই অস্থির ভাবে লাফাতে থাকে বিলি। শুধু লম্বা শেকলটা আছাড় খেয়ে ঝন্‌ঝন্ করে বাজতে থাকে।

বিলির মতিগতি দেখে আমার সন্দেহ হতো—বাঘ কি কখনো পোষ মানে? ওর রক্তের ভেতর জঙ্গল রয়েছে। একদিন না একদিন...।

কিন্তু কে বলবে পোষ মানেনি বিলি? যখন বড় বেশী দুরন্তপনা করতো বিলি, তখন সত্যিই একটু বিরক্ত বোধ করতাম। তা ছাড়া, কুকুর আর ঘোড়া দেখলেই বিলির ঐ সব হিংসুটে চালিয়াতি দেখলে আমার বড় রাগ হতো, তখনি উঠে গিয়ে জোরে হাঁক দিয়ে ডাকতাম--বিলি! কানের ওপর জোরে একটা গাঁট্টা মারতাম। বিলি তখুনি মাটির ওপর একেবারে চার পা তুলে চিৎ হয়ে ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটা কাতর শব্দ করতো। দেখে মনে হতো, যেন তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে বিলি। তাই মাপ চাইছে।

আমি ছিলাম বিলির শাসক। বিলি আমার বাধ্য ছিল। বিলি আমাকে ভয় পেত। কিন্তু আর একজন ছিল, যার কাছে বিলি আদরে ও আহলাদে আটখানা হয়ে যেত। এক নেপালী বুড়ো, তার নাম পোহাল সিং, সেই মোটর কোম্পানীর অফিসের দারোয়ান। নেপালী বুড়ো পোহাল সিংয়ের কাছে বিলির কোন শাসন ছিল না। শুধু আদর আর আদর। কে যে কাকে বেশী আদর করতো বোঝা যেত না।

বিলি যখন খেয়েদেয়ে টান হয়ে শুয়ে ঘুমোত, পোহাল সিং পাশে বসে বিলির গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। লক্ষ্য করতাম, পোহাল সিংয়ের ছোট ছোট চোখের মোটা ভুরু দুটো আনন্দে কুঁচকে উঠছে। বিলির মোটা গর্দানটাকে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চুলকিয়ে দিত পোহাল সিং। তারপর যেন নিজের মনের আহলাদেই গদগদ হয়ে বলে উঠতো--আহা! পশু হ্যায়, পশু হ্যায়!

জেগে উঠতো বিলি। এইবার বিলির পালা। নেপালী বুড়োর ঘাড়ের ওপর থাবা রেখে টান হয়ে বিলি দাঁড়াতো। বুড়োর মাথার টুপিটা কামড় দিয়ে মাটিতে নামাতো। খিল খিল করে ছোট ছেলের মত হেসে উঠতো নেপালী বুড়ো পোহাল সিং। বিলি তখুনি আর একদফা আক্রমণ করতো, নেপালী বুড়োর গরম কোটের আস্তিনটাকে কামড়ে ধরতো। একটি ঝাঁকুনি দিয়ে ফর্ ফর্ করে ছিঁড়ে ফেলতো। পোহাল সিং তবু হি-হি করে হেসে শুধু মজা দেখতো আর বলতো—আহা! পশু হ্যায়! পশু হ্যায়!

পোহাল সিংয়ের জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলা বিলির যেন প্রতিদিনের খেলা ছিল। পোহাল সিংয়ের বউ রোজই জামার আস্তিন সেলাই করতো। এই ব্যাপার নিয়ে বুড়ো-বুড়ীতে রোজই একটা ঝগড়া হতো। কিন্তু পোহাল সিং গ্রাহ্য করতো না। জামার আস্তিন রোজই সেলাই হতো, রোজই বিলি একবার করে ছিঁড়ে ফেলতো।

বিলিকে শাসন করার সময় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখতাম, পোহাল সিং আছে কি না। একদিন দেখলাম, একটা ভিখারী ছেলের দিকে তাকিয়ে বিলি আবার থাবা ঘসছে আর গোঁপ চাটছে। ভয়ানক রাগ হলো। মানুষের সংসারে থেকেও মানুষ চিনতে শিখলো না জানোয়ারটা! উঠে গিয়ে বিলির কানের ওপর জোরে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলাম। বিলি তার অপরাধ স্বীকার

করে নিয়ে মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে ক্ষমা চাইতে লাগলো। পরমুহূর্তেই দেখলাম, বারান্দায় থামের আড়াল থেকে এক জোড়া জ্বলন্ত নেপালী চোখ তাকিয়ে আছে। সমস্ত ঘটনাটাকে দেখছে। তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই পোহাল সিং এসে সামনে দাঁড়ালো। দেখলাম, রাগ চাপতে গিয়ে পোহাল সিংয়ের মুখটা লাল হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আম্‌তা আম্‌তা করে পোহাল সিং বললো--বাবু, বিলিকে আপনি মিছামিছি মারেন। এটা উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম--কেন?

পোহাল সিং উত্তর দিল—পশু হ্যায়! ওকে মেরে কি লাভ হবে?

পোহাল সিংয়ের মুখে ঐ এক কথা--পশু হ্যায়! পশু হ্যায়! এর মানে কি? কি বলতে চায় নেপালী বুড়ো? পশু হ্যায়, অর্থাৎ ওর সাত খুন মাপ। ওকে শুধু দই মংস খাওয়াতে হবে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হবে। পোহাল সিং চায়, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়ে উঠুক। কিন্তু তা কি করে হয়? তবে জঙ্গল থেকে বিলিকে নিয়ে এলাম কেন? আমরা বাঘের বাচ্চাকে পোষ মানাতে চাই, মানুষ করতে চাই।

একটা ঘটনায় বিলির ওপর বড় খুশী হয়ে উঠলাম। বিশ্বাস হলো, বিলি সত্যিই মানুষ হয়ে উঠবে। সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

বিলেত থেকে করিন্থিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়ের দল ভারতবর্ষে ম্যাচ খেলতে এল সেই বছর। আমাদের শহরেও একটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। খেলার মাঠে এত লোকের ভীড় কোনদিন হয়নি। লাট সাহেবও এসেছিলেন। খেলা আরম্ভের আগে করিন্থিয়ান দল আর ভারতীয় দলের ফটো তোলা হলো। ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারার করিন্থিয়ানেরা সার বেঁধে দাঁড়ালো। করিন্থিয়ান দলের ক্যাপ্টেন সগর্বে একটা সিংহকে কোলে নিয়ে দাঁড়ালো।

তুমি বোধ হয় শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছো পুতুল। সিংহ কোথা থেকে এল? কিন্তু সত্যিকারের সিংহ নয়। ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে তৈরী একটা লিক্‌পিকে সিংহ। দেখেই ঘেন্না হয়। কিন্তু ঘেন্না হলে হবে কি, ঐ ফ্লানেলের সিংহ কোলে নিয়েই করিন্থিয়ানেরা সগর্বে দাঁড়িয়েছিল।

এখন আমরা কি করি? ভারতীয় দল কি শুধু এই সসিংহ সাহেব খেলোয়াড়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? তা হয় না। আমাদের বিলি, পোহাল সিংয়ের প্রিয় পশু আমাদের হাতের কাছেই আছে! একেবারে জলজ্যান্ত জোয়ান সোনা চিতা।

বিলিকে তখুনি ময়দানে আনা হলো। আমাদের ভয় হলো, অবাধ্য দুরন্ত বিলি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন কোলে চড়বে কি না। হয়তো হুটোপাটি করে আর একটা হাস্যকর তছনছ কাণ্ড করে বসবে।

বিলির গলার শেকল খুলে দিলাম। ভারতীয় দলের সামনে এগিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন সামাদ বিলিকে কোলে তুলে নিল।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বিলি একটুও দুষ্টুমি করলো না। ক্যাপ্টেন সামাদের কোলে উঠে শান্ত হয়ে বসে রইল বিলি। মোটা গর্দান উঁচিয়ে একবার করিন্থিয়ানদের লিক্‌পিকে সিংহটার দিকে দৃপ্তভাবে তাকালো। সমস্ত গ্যালারিতে হাততালির শব্দ বাজতে লাগলো।

বাঃ রে বিলি বাঃ! সেই দিন প্রথম সত্যি করে আদর করলাম বিলিকে। এত নির্বোধ দুরন্ত বিলি, কিন্তু আমাদের সম্মানের সমস্যাটা বুঝতে একটুও দেরি হয়নি বিলির।

মাত্র দু'দিন পরেই এই বিশ্বাস নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিল বিলি। জংলী হিংসুক বুনো বিলি।

একটা ছোট ছেলে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিলিকে দেখছিল। হঠাৎ বিলি একটা লাফ দিয়ে উঠে ছেলেটাকে থাবা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপরেই ছেলেটার ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন দৌড়ে এসে ছেলেটিকে উদ্ধার করে সরিয়ে নিয়ে গেল। তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। ছেলেটির ঘাড়ের ওপর বিলির দাঁত বসে গিয়ে একটু জখম হয়েছিল।

ব্যস্, আর নয়। বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে। বাঘের বাচ্চা কখনো মানুষ হতে পারে না। বুঝলাম, দই মাংস খাইয়ে একটি মানুষের শত্রুকে আমরা বড় করে তুলেছি।

জনমতের আদালতে বিলির বিচার হয়ে গেল। সবাই একমত হলো—এই হিংস্র জীবকে এখুনি বিদায় করে দেওয়া উচিত। তথাস্তু। কিন্তু কি ভাবে বিদায় করা হবে? জেল না নির্বাসন?

করিন্থিয়ানদের সঙ্গে ম্যাচের দিনে বিলি যে মস্ত বড় একটা মানুষী কীর্তির সার্টিফিকেট পেয়েছিল, তারই জোরে জেল থেকে বেঁচে গেল বিলি। সবাই বললেন—চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল....।

তার চেয়ে ভাল কি? নির্বাসন? তা হলে কি কোন মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে বিলিকে ছেড়ে দিয়ে আসবো?

না, তাও নয়। সবাই বললেন—ঐ বনের পশুকে বনেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

তাই ঠিক হলো। কিন্তু আমার মনে একটা রাগ রয়ে গেল। এ তো ঠিক শাস্তি হলো না। এ যে বিলির মুক্তি। সেই মহুয়াতলার কুয়াসা, ঘন বনের ছায়া আর পাথুরে গুহার অন্ধকার আবার ফিরে পাবে বিলি। বেশ, তাই হোক।

বিলিকে গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে আমরা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছি, নেপালী বুড়ো পোহাল সিং গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। ছটফট করে গাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলো।—পশু হ্যায়! পশু হ্যায়! পোহাল সিং শুধু ব্যর্থ আক্রোশে গজ্ গজ্ করতে লাগলো।

জায়গাটার নাম কুসুম্ভা। ঘন জঙ্গল। জ্যোৎস্না রাত্রি। বিলির গলার শেকলটা আমি শক্ত করে ধরে আছি। আমার সঙ্গে আরও দুটি বন্ধু আছেন বন্দুক নিয়ে। জঙ্গলের একটু গভীরে নিয়ে বিলির শেকল খুলে দেব। বিলিকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। জঙ্গলের জ্যোৎস্না আর গন্ধের নেশায় বিলি যেন ফুর্তিতে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে চাইছে। বিলি যেন আমাকেই হেঁচড়ে নিয়ে চলেছিল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা বুনো বটের ছায়ার অন্ধকারে আমরা দাঁড়ালাম। এইখান থেকে জঙ্গলটা আরও ঘন হয়ে একেবারে হিংস্র হয়ে গেছে। এইখানে বিলিকে এইবার ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

জ্যোৎস্না রাত্রের জঙ্গলে আরেক রকমের ভয় আছে। একটা নিঃশব্দ আলোছায়ার ষড়যন্ত্র। অতি প্রাচীন পৃথিবীর হিংসাগুলি দল বেঁধে লুকিয়ে আছে প্রতিটি পাতার আড়ালে। সামান্য একটু হাওয়া লাগলেই যেন ফিস্ ফিস্, দূর্ দূর্, মর্ মর্, খা খা, যা যা শব্দ করতে থাকে। চোখে বিভ্রম লাগে। পথ ভুল হয়ে যায়। দিক ঠাহর হয় না।

বিলির শেকল খুলে দিলাম। একটা লাফ দিয়ে বিলি শুকনো পাতার স্তূপের ওপর গিয়ে পড়লো। তারপরেই ঘাড় তুলে সামনের আলোছায়ায় ঠাসাঠাসি বনের রহস্যের দিকে যেন বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল। পরমুহূর্তে আর একটা লাফে একেবারে আমাদের পাশে চলে এল বিলি। পা ঘেঁসে সুবাধ্য পোষা জীবের মত শান্ত হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বিলি নড়ে না। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম দূরে শুক্‌নো পাতার ওপর। বিলি শুধু শব্দটা শুনলো, কিন্তু এক পা নড়লো না।